

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনজুমান আরা মিতু

রোলঃ 228021197

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনজুমান আরা মিতু

রোলঃ 228021197

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আনজুমান আরা মিতু, আইডিঃ 228021197 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারায়াত কারীম

এরারবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

— (স্বাক্ষর) —

আনজুমান আরা মিতু

আইডি: 228021197

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ	5
বাংলাদেশে মিশনারির আগমনঃ	6
খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রকৃত উদ্দেশ্যঃ.....	8
যে সমস্ত এনজিও সেবার নামে সরাসরি ধর্ম প্রচার করছেঃ.....	8
এনজিওদের কার্যক্রমঃ	9
পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি	10
সাঁওতালঃ.....	13
২০২৫ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা	16
Board of Directors এর প্রস্তাব	18
মিশনারির স্বরূপ সন্ধানে	18
মিশনারি শ্রেণীবিভাগ	19
বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক	19
প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম.....	20
প্রকাশনা	21
প্রকাশনায় অপকৌশল	21
মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল	22
ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার	22
বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি.....	23
পবিত্র কুরআনের অপব্যখ্যা.....	23
কারগুজারিঃ	25
মাদারগঞ্জে কয়েক হাজার খৃষ্টান	26
মসজিদের খতীব খৃষ্টান.....	27
ঝিনাইদহে মুরতাদদের সাথে একদিন.....	28

মুসলমানদের গ্রামে খৃষ্টানদের চার্চ	29
খৃষ্টানদের চ্যালেঞ্জ	30
কুরআন ও হাদিসের আলোকেঃ	36
খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধের উপায়সমূহঃ	36
উপসংহারঃ	38
রেফারেন্সঃ	39

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশে ঔপনিবেশিক শাসনামলে খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। তবে তাদের এই কর্মকাণ্ডের অনেকটাই ছিল সুপারিকল্পিত এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট। খ্রিস্টান মিশনারিদের একটি বড় অংশ ধর্মান্তরের উদ্দেশ্যে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করেছে। তারা শিক্ষা ও চিকিৎসার আড়ালে অনেক সময় ধর্মীয় কৌশলে স্থানীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে অবমূল্যায়ন করেছে, যা পরোক্ষভাবে একটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য ও পরিচয়কে হুমকির মুখে ফেলেছে। ইসলাম শান্তি, মানবতা এবং তাওহিদের ধর্ম। যুগে যুগে ইসলাম মানব জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে এবং শিরক, কুফর ও অন্যায়ে বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। তবে ইসলামী আদর্শ নস্যাত্ন করতে বিভিন্ন সময় নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে। বিশেষত খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্ম প্রচারের নামে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। দেশের প্রায় অধিকাংশ জেলাতে তারা মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে যীশু খ্রিষ্টের বই, যীশু খ্রিষ্টের জীবনী ইত্যাদি পড়ানো হচ্ছে। ছোটদেরকে ‘সিবগাতুল্লাহ’ নামের একটি বই পড়ানো হয়, যাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করে ছোট বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। জার্মানভিত্তিক ন্যাজরিয়ান মিশন সংগঠনটি বিনামূল্যে বই, খাতা, পোশাক এমনকি দুপুরের খাবারসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকার উপজাতীয়দের মধ্যে মিশনারী কাজ করে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতার পর হতে লাল সবুজের এই দেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেমে নেই। আন্তঃ সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে ভিনদেশী বেনিয়াদের কূটচাল। সেবার আড়ালে করছে মুসলমানদের ঈমানহরণ ও বাংলাদেশকে খন্ডিত করার নীল নকশা। তারই একটি অংশ হলো; খ্রিস্টান মিশনারী। মিশনারী এটি খ্রিস্টানদের একটি দাওয়াতী সংস্থা। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে লক্ষ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে তারা খ্রিস্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে আসছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৬০০ -১৭০০ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের সাথে তৎকালীন বাংলা ও ভারতে খ্রিস্টান মিশনারীরা আগমন করে। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় তারা ২০০ বছর পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর তৎকালীন আইয়ুব খান সরকার তাদের সাহায্য করলে তারা আসকারা পেয়ে নেটওয়ার্ক ঢাকাতেও বিস্তৃত করে। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল মিশনারি তৎপরতার অন্তর্নিহিত রাজনীতি ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার অনুসন্ধান করা এবং ধর্ম প্রচারের নামে কোন কোন অপতৎপরতা সংঘটিত হয়েছে, তা চিহ্নিত করা।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো-

- ❖ খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য উন্মোচন করা ।
- ❖ ইসলামের প্রতি তাদের বৈরিতা ও ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা তুলে ধরা ।
- ❖ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের অপতৎপরতা বিশ্লেষণ করা এবং
- ❖ মুসলিম সমাজের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করা ।

গবেষণার পরিধি ও পদ্ধতি:

এই গবেষণায় মূলত কুরআন-হাদীস, ইসলামী পত্রিকা (বিশেষত মাসিক আল-কাওসার), ইতিহাসগ্রন্থ এবং সমকালীন সংবাদ-উপাত্তকে ভিত্তি করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে তৃণমূলের কিছু পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব ঘটনার বিশ্লেষণও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণাটি বস্তুনিষ্ঠ ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মিশনারির আগমনঃ

মিশনারি হলো খৃষ্টানদের দাওয়াতি সংস্থা। সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে খৃষ্টানরা খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে আসছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আজ থেকে পাঁচশ বা ছয়শ বছর আগে খৃষ্টান মিশনারিরা এই বাংলায় আসে। পর্তুগিজরা যখন বাংলায় বা ভারতে আসে তখন সাথে করে খৃষ্টান মিশনারিদেরও নিয়ে আসে। জেসুইস ও অগস্টেইনিয়া নামক ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দুটো দল পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় ২০০ বছর যাবত বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করে আসছে। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিলে তাদের ছত্রছায়ায় মিশনারিরা এসে এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করলো, স্কুল বানালো, হাসপাতাল চালু করলো। হুগলিকে কেন্দ্র করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তারা ঢাকাতেও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করলো।

এভাবে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে এতদাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারি তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-খেরাজ) খৃষ্টান মিশনারিদের দান করলেন। ফলে তারা আরো বেশী উৎসাহিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোঘল আমলে খৃষ্টান মিশনারিরা অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে তোলে। (আমাদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমন খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে, যেমন – জেসুইল,

অগস্টেইনিয়া, ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি) মোগল আমলে মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে ১৩ টি অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে উঠে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশী। ব্যাপটিস্টদের সংখ্যাও কম নয়।

১৯০৮ সালে ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ব্যাপটিস্টরা এসে একটি সোসাইটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। লেবুসি হসপিটাল কুষ্ঠনিরাময় কেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে মোট খৃষ্টান সংখ্যা ৫ লাখ, এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা হাতে নিলো, তখন মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চালু হয়। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের পর এই উপমহাদেশে ৯০ টি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান মিশনারি কর্মরত ছিল। তারা এদেশে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্যে বড় বড় ডাক্তার, সার্জনদের ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসে এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মালুমা ঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরি করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়। এর আড়ালে সমতল ভূমি ও পার্বত্য এলাকায় খৃষ্টধর্ম প্রচার পুরোপুরি অব্যাহত রাখে।

৭১ এ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রায় ৩০,০০০ এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। এই এনজিওরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। প্রশ্ন জাগে, এই টাকা দেয় কারা? তাদের তো টাকশাল নেই, তারা টাকা বানায় না। বিশ্বের বড় বড় ধনকুবেররা ইয়াহুদি ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। আর কোন ধনকুবের বরং সাধারণ সম্পদশালীও তার অর্থ বেকার খরচ করে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর জন্য তারা কোটি কোটি টাকা খৃষ্টান মিশনারিতে দেয়।

খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য:

১. ধর্ম প্রচার (Evangelism):

প্রধান উদ্দেশ্য হল খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করা। মানুষকে যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা ও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। এটি মিশনারিদের মূল ধর্মীয় দায়বদ্ধতার অংশ। তারা বাইবেল অনুবাদ করে স্থানীয় ভাষায় প্রচার করেন, ধর্মীয় গ্রন্থ বিতরণ করেন এবং গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে তারা সহজ সরল মানুষকে ধর্মান্তরিত করেন এবং খ্রিস্ট ধর্মের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

যে সমস্ত এনজিও সেবার নামে সরাসরি ধর্ম প্রচার করছেঃ

অসহায়, নিরক্ষর মানুষকে সেবা দেওয়ার নামে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে যে সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালাচ্ছে তার মধ্যে কিছু হলো (১) কারিতাস, (২) এন.সি.সি. (ননলাইট সেন্ট্রাল কমিটি), (৩) লুথারান মিশন, (৪) দ্বীপশিখা, (৫) সালভেশন আর্মি, (৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন, (৭) সি.ডি.এস. (সেন্ট্রাল ফর ডেভেলপম্যান্ট সার্ভিস), (৮) আর.ডি.আর.এস. (রংপুর দিনাজপুর রোড এন্ড সার্কেল), (৯) সি.সি.ডি.ভি. (খৃষ্টান কমিশন অফ ডেভেলপম্যান্ট), (১০) হিড বাংলাদেশ, (১১) সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট, (১২) চার্চ অফ বাংলাদেশ, (১৩) পের ইন্টারন্যাশনাল, (১৪) সুইডিশ ফ্রেমিশন, (১৫) কনসার্ন, (১৬) এডরা, (১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি, (১৮) এমসিনি, (১৯) ওয়াই.ডব্লিউ.সি. (২০) ফেমিলিজ ফর চিলড্রেন, (২১) আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট ইত্যাদি। এসব সংস্থা বাজেটের ৯০ ভাগ খৃষ্টানদের অথবা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনায়ময় ব্যক্তিদের পিছনে ব্যয় করে থাকে।

এনজিওদের কার্যক্রমঃ

চার্চ অফ বাংলাদেশ

ডঃ জিগা বি. আলসেনের পরিচালনায় চার্চ অফ বাংলাদেশ নামে একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও যা মৌলবাদী এনজিও, ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে মেমোরিয়াল হসপিটাল নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল তৈরি করে। এলাকার লোকজন ছিল অভাবগ্রস্ত ও নিরক্ষর। এই সুযোগে ড. জিগা বি আলসেন তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে সেবাদানের মাধ্যমে ৩৮ বছর এই মালুমঘাটের চকরিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মালুমঘাটে যেখানে একজনও খৃষ্টান ছিল না, তার প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নয়া খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে তারা বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে। সেখানে দুর্গম এলাকায় পাহাড়ের ভিতরে তারা গির্জা নির্মাণ করেছে।

সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট

এই “সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট” খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫ টি প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে। এসব স্কুলে কোন মুসলমানের সন্তান ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সনে এই “সেভেন ডে চার্চ” ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে।

হিড বাংলাদেশ

“হিড বাংলাদেশ” নামে এ এনজিও মৌলভী বাজারে, কমলগঞ্জে, সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। সূচনাতেই তারা ৬ লক্ষ মার্কিন ডলার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

সি. সি. ডি. ভি.

“সি. সি. ডি. ভি.” নামক সংস্থা রংপুর, দিনাজপুরসহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কাজ করছে। আর “ডি.আর. আর. এস.” এর সমস্ত সংগঠন টাকা নেয় সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড থেকে। টাকা আনে মিস্টার টরবেন পিটারসের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে ২১৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে সাঁওতাল উপজাতিদেরকে দাওয়াত দিয়ে ৩৫ হাজার সাঁওতালকে তারা খৃষ্টান বানিয়েছে।

পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি

এগুর্গা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম, ত্রিপুরা, খাশিয়া, মনিপুরী, খিয়াং, মাংখু, লুশাই, মগ, গারো, মুরু, সাঁওতাল, রাখাইন, হাজং, রাজবংশী, মুরং, কুকি, হুদি, পাংখো, উড়াও, বোনজোগী, দালই, লুসাই, খুশী, তংচংগা, বংশাই, বোম, মুনী চাক, চোক, হরিজন, মুন্ডা ইত্যাদি – এগুলো আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠী। এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। বৈবাহিক ক্ষেত্রে তারা বংশীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু “পাঙন” সম্প্রদায় ছাড়া অন্য উপজাতির অধিকাংশ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আবার ১০.৫ % হিন্দু জনসংখ্যার বিপুল পরিমাণ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

২. শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান: তারা অনেক মিশনারি স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। তাদের বিশ্বাস, শিক্ষিত ও সুস্থ সমাজে ধর্ম প্রচার বেশি কার্যকর হবে। এই কার্যক্রম অনেক সময় মানবসেবামূলক হলেও ধর্মীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত। তাদের হাসপাতালে প্রতিদিন অনেক মুসলমান চিকিৎসা নেবার জন্য যায়। আর এ সুযোগে তারা ধর্মান্তরে আকৃষ্ট করার চাতুরীপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে। খ্রিস্টান মিশনারীগুলোর অনুদাননির্ভর এনজিওদের দ্বারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ শ্লোগানের আড়ালে সেখানে কোমলমতি শিশুদের মনে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। যেমন: খ্রিস্টান মিশনারীগুলোর অনুদাননির্ভর একটি এনজিও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলে জনৈক শিক্ষিকা ছাত্রদের বললেন, বাড়িতে তোমাদের আবু-আম্মু তোমাদের বেশী ভালবাসেন, না তোমাদের বাড়ির সেবকদের (কাজের লোকদের)? উত্তরে কোমলমতি শিশুরা বলল, বাবা-মা আমাদের বেশী ভালোবাসেন। তখন শিক্ষিকা বললেন, তোমাদের বাবা-মা তোমাদের স্নেহ করেন এজন্য যে, তোমরা তাদের সন্তান। তেমনি খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু হলেন আল্লাহর পুত্র, আর মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর বান্দা বা দাস। এখন বল! পুত্র হিসাবে আল্লাহ যীশুকে বেশী ভালোবাসেন, না মুহাম্মাদকে? খ্রিস্টানরা পরিকল্পিতভাবে খ্রিস্টধর্মের বর্তমান বিকৃতরূপকে জাগতিক উন্নতি, পরকালের মুক্তির একমাত্র সহজ উপায় হিসাবে উপস্থাপন করেছে। তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিল হিসাবে হযরত ঈসা আ. সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহকে পেশ করেছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে আত্মভোলা সহজ-সরল জনগোষ্ঠী। ধর্মান্তরিত হচ্ছে অনেক মানুষ। যাদের ধর্মান্তর করার জন্য টার্গেট করা হয়, তাদের ধারণা দেয়া হয় যে, পূর্বের নবীদের উপর ঈমান রাখাও ইসলামের মৌলিক বিধান। এক্ষেত্রে উপমা হিসাবে ঈমানে মুফাস্সালের অংশবিশেষ ‘নবীদের উপর ঈমান আনয়নের’ আবশ্যিকতার প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করা হয় অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, খৃষ্টানরা যেখানেই গেছে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে আর সমাজের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ

করেছে। হাসপাতাল স্থাপন, ঋণসুবিধা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন তাদের অন্যতম শ্লোগান আজ। তবে খৃষ্টধর্ম প্রচারই তাদের মূল লক্ষ্য। যা সেবার ছলনায় শুরু থেকেই তারা বাস্তবায়ন করে আসছে।

৩. পশ্চিমা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিস্তার: কিছু মিশনারি পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে "উন্নততর" মনে করে তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। এর ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির উপর একধরনের সাংস্কৃতিক প্রভাব বা আধিপত্য বিস্তার হয়েছে।

৪. ঔপনিবেশিক নীতির সহায়ক ভূমিকা: বিশেষ করে ঔপনিবেশিক যুগে, কিছু মিশনারি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদকে সহায়তা করেছেন। ধর্ম প্রচারের আড়ালে তারা রাজনৈতিক প্রভাবও ফেলেছেন বলে ইতিহাসবিদদের একাংশ মনে করেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের অপতৎপরতাঃ

দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন মূল দাবী হলেও তাদের কোন কোন এনজিও এসব কর্মকাণ্ডের আড়ালে খৃষ্টান মিশনারির “ধর্মান্তর কর্মসূচি” প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে ধর্মান্তরের প্রধান টার্গেট বানায়। খৃষ্টান মিশনারি ও তাদের সহযোগী এনজিওগুলো কাজের ও কর্মসূচীর দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। উভয়ের প্রধান লক্ষ্য বিশ্বে খৃষ্টান জনসংখ্যার বিস্তার ঘটানো। এ লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের দেশে এনজিও ও মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল। বাংলাদেশের খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করলে সে কথার প্রমাণ মিলে।

১৮৮১ সালে প্রতি ৬ হাজার লোকের মাঝে ১ জন খৃষ্টান ছিল। সে সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতি ৩২৬ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৮১ সালে প্রতি ২৯ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৯১ সালে প্রতি বাইশজনের মাঝে একজন খৃষ্টান রয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৯ সালে খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালে আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঢাকায় খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় গির্জা “হলি রোজারি”। ১৮৭৭ সালে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীগণ এটি নির্মাণ করেন। ১৯৫২ সালে উক্ত গির্জায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৫৩ জন আর ১৯৭৬

সালে তা ৩০০০ জনে উন্নীত হয়, ১৯৮৩ সালে উপস্থিতি ৬০০০ জনে আর ১৯৯৮ সালে উপস্থিতির সংখ্যা ৫০,০০০ এ পৌঁছে।

বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও সংখ্যা ৮৫০। এর বাইরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন নিয়ে কাজ করছে এমন এনজিওর সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ হাজার অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি ১.১৮ বর্গমাইলের মাঝে একটি এনজিও কাজ করছে।

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের বিস্তার সম্পর্কিত ব্যাপারগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ পর্যন্ত এনজিও আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা ৪০ হাজার, পরিবারের সংখ্যা ৩৫ লাখ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এনজিওদের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা। উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০ হাজার। ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ১০ লাখ, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৪৪ লাখ, এনজিওদের রোপণকৃত বৃক্ষের সংখ্যা ৪ কোটি। উপরোক্ত তথ্য ও সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। কিন্তু ২০১০ সালে মদিনা ইউনিভার্সিটি একটি পরিসংখানে দেখায়, বাংলাদেশে বর্তমান খৃষ্টানদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি। আর বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটির উপরে। মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আর খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে, তারা কি একজন ১৩ জন করে সন্তান জন্ম দিয়েছে? আবার, জন্মনিয়ন্ত্রণ থিওরি তাদেরই মতবাদ। যদি বলা হয়, না; তাহলে এই বাকি জনসংখ্যা এলো কোথেকে? অবশ্যই এরা ধর্মান্তরিত খৃষ্টান।

সাঁওতালঃ

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক বেশীরভাগ বসবাস করে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলে।

পীরগঞ্জ থানার একটি পল্লীর কথা আলোচনা করবো, এই তথ্যটি “ধর্মাস্তরের খোলা হাওয়া” ৭১ নং পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা সাঁওতাল উপজাতির একটি দরিদ্র পল্লী। এ অঞ্চলে এ ধরনের বেশ কয়েকটি উপজাতি পল্লী আছে। যেমন – চৈত্রকল (মাহেলিপাড়া), খালিসা (মিশনপাড়া), বসুদেবপুর (ডুমারপাড়া), অনন্তরামপুর, দুর্গাপুর, উধলাপাড়া, পৈত্রীপাড়া, কাদিরাবাদ, মুনাইল ইত্যাদি।

এরা সবাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সাঁওতাল, বুনো, উড়াও ও পৈত্রী ইত্যাদি নামে বিভক্ত। এদের পেশারও ভিন্নতা রয়েছে। কেউ বাঁশ-বেতের কাজ করে, কেউ করে কৃষি কাজ। এদের কারো স্থায়ী আয়ের কোন উৎস নেই। মুসলমান পাড়ায় গতর খেটে এবং বাঁশ-বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির। আলোচিত পল্লী রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার “চৈত্রকল ইউনিয়নে” অবস্থিত। এ ইউনিয়নের উপজাতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। তারা সবাই নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।

ক্ষুধা এদের নিত্যদিনের সাথী, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত জীবন, দারিদ্রের নির্মম ক্ষতচিহ্ন এদের চেহারায়ে। বঞ্চনাকে ওরা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হিসেবে মেনে নিয়েছে। দুঃখ ও যন্ত্রণাকে ওরা ভাগ্যলিপি হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাই এর জন্য ওদের কারো প্রতি ক্ষোভ ও খেদ নেই। আছে শুধু জীবনের অচল চাকা একভাবে চালিয়ে নেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস। জীবনের গ্লানি ও যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য হয়তো তারা মদ ও নেশা প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছে। সভ্যতার আলো আজও ঐ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করেনি। তারা এখনো আদিম প্রথায় জীবন চালায়। শিক্ষা, চিকিৎসা এ অন্ধকার পল্লী থেকে নির্বাসিত।

তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সীমিত। বছরে একবার তারা ডালপূজা করে। অর্থাৎ গাছের একটি ডাল আসরের মধ্যভাগে পুঁতে তাকে ঘিরে সারারাত নারী-পুরুষ কীর্তনের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। কৃষি মওসুমে যখন কাজ থাকে, তখন তারা মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বিত্তবান ও স্বচ্ছল লোকদের বাড়িতে মজুরী খাটে। যখন কাজ থাকে না, আকালের সময় বনে জঙ্গলে বিভিন্ন গাছের পাতা ও বনজ আলু কুড়িয়ে আনে। হলুদ মরিচ মসলা ছাড়া শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে আলু দিয়ে তারা ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে। শীতের সময় এসব মানব সন্তানরা শীত নিবারণের জন্য আদিম প্রথায় উঁচু করে মাচা বাঁধে আর নিচে

আগুন জ্বালিয়ে বসে রাত কাটায়। রংপুর, পীরগঞ্জ অঞ্চলে ছয় মাস পর্যন্ত আকাল থাকে। তখন তাদের কাজ থাকে না। আবার যারা বাঁশ-বেতের কাজ করে, তারাও তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারে না। তখন জীবন একেবারে অচল হয়ে পড়ে। মুসলমান পাড়ায় গিয়ে চেয়ে-চিন্তে ধার-কর্জ করে চলতেও তারা অভ্যস্ত নয়। অভাবের সময় এসব দরিদ্র পল্লীতে সরকারী-বেসরকারী পর্যায় ঋণদানেরও কোন প্রথা চালু নেই।

সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র রংপুর জেলার চৈত্রকল ইউনিয়নের। সেখানকার ছাব্বিশটি পরিবার প্রায় সবাই ইতিমধ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। চৈত্রকলস্থ “খলিশা মিশন” এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। পল্লীর নিভৃতকোণে নীরব বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিশাল জমির উপর প্রতিষ্ঠিত খলিশা মিশনে স্থায়ীভাবে বহুলোক কর্মরত আছেন। এ মিশনে আছে চিকিৎসা সেবা ও দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ।

মাহেলী পাড়ার জনসংখ্যা প্রায় দুইশত। ওখানে সদ্য নির্মিত হয়েছে মনোরম একটি গির্জা। এর তত্ত্বাবধান করেন লুইস দুখু। তাকে প্রশ্ন করা হলো, উপজাতি সম্প্রদায় এদেশের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতির অঙ্গ। এ ঐতিহ্য-চ্যুতির কারণ কি? উত্তরে তিনি জানান, আমরা অবহেলিত সম্প্রদায়। আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার কেউ নেই। খৃষ্টানরা আমাদের কাছে আসে, তারা আমাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। তাদের আদর-যত্ন আমাদের আকৃষ্ট করেছে। খৃষ্টানরা কোন বৈষয়িক বিষয়ে সাহায্য প্রদান করে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, কই, তারাও তো কোন সাহায্য করছে না।

উধলাপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধা নৌরি, স্বামী রামধন। তার কাছে জানতে চাওয়া হলো, জীবন কেমন চলছে? উত্তরে তিনি বললেন, কষ্ট করে চলি। সেখানকার উপজাতিদের দারিদ্র্য বিমোচনের কোন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। এ দরিদ্র পল্লী আগে যে তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই আছে। হওয়ার মাঝে হয়েছে শুধু উপজাতির ধর্মীয় পরিচয় বিলুপ্তি। সুচতুর খৃষ্টানরা হয়তো জানে, কোন জাতি ও সম্প্রদায়কে ছলে-বলে, কৌশলে একবার ধর্মান্তরিত করতে পারলে তাদের প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ সাময়িক।

তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে – তারা খৃষ্টানের ঘরে খৃষ্টান।

এ তো হলো একটি ইউনিয়নের প্রতিবেদন, এ ছাড়া কতো ইউনিয়ন গ্রাম রয়েছে, সেখানে যারা এদের মতো বা এদের চেয়ে বেশী আমাদের কাছে সর্বদা অস্পৃশ্য সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আমরা তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না, যা ছিল আমাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও ঈমানি ফরিয়া। পাশে না দাঁড়ানোর ফলে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের পাশে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে ধর্মান্তরিত করেছে। উচিৎ তো ছিল আমরা তাদের খোঁজ খবর নিবো।

উপজাতি সম্প্রদায় আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। নিবেদিত প্রাণ এসব হতদরিদ্র আদম সন্তানদের খোঁজ নেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু আমরা কি এ দায়িত্ব পালন করছি? অথচ প্রতিবেশীর সেবা ও খোঁজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

ইসলাম আমাদেরকে প্রতিবেশীর কর্তব্য পালনের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন – “যে ব্যক্তি পেটপুরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত পোহায়, সে আমার উম্মত নয়।” অন্যত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন – “আল্লাহ’র শপথ, সে ব্যক্তি মুমিন নয়।” এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এ কোন ব্যক্তি।” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশীর সম্পদ ও ইজ্জত নিরাপদ নয়।” এ থেকে প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের কোন পার্থক্য নেই। প্রতিবেশী যে পরিচয়েই হোক, তার প্রতি বিশেষ কর্তব্য পালনকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এ মহান কর্তব্যটুকু আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা যথাযথভাবে পালিত হয়েছিলো বিধায় দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। বড় আফসোস! আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের হতভাগা অংশ (নোটঃ লেখক “হতভাগ্য উম্মত” লিখেছিলেন, আমি সেটা চেইঞ্জ করে দিয়েছি)। আরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত নীতি বিচ্যুত হয়েছি। সেজন্য এতো দুর্গতি ও লাঞ্ছনা। এখানে একটি কথা নির্দিষ্ট বলা যায় – আজ আমরা যাদের অবহেলা ও তচ্ছিল্য ভরে দূরে সরিয়ে রাখছি, যাদের প্রতি আমাদের ন্যূনতম কর্তব্যবোধ আছে বলে মনে করছি না। হয়তো এমন দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এসব অবহেলিত সম্প্রদায় একটি বৃহৎ জাতিতে রূপ নিবে। তারা প্রশিক্ষিত হবে, আর অতীত বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার জন্য আমাদের দায়ী করবে। স্থায়ীভাবে আমাদের মাথা ব্যাথার কারণ হবে। তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লেবানন। সেখানে খৃষ্টানরা স্থায়ীভাবে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ মুসলিম দেশকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ইসলাম হলো আমাদের কাছে আমানত। আমরা কি এই আমানত তাদের কাছে পৌঁছিয়েছি? ইসলামের দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার। আমরা কি তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিনি? এখনো সময় আছে তাদের পাশে দাঁড়বার। এখনো সময় আছে তাদের আমানত পৌঁছানোর। আসুন, আজ থেকে আমরা তাদের হক পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করি।

জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেই। যা ছিল আমার আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সূনাত।

২০২৫ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খৃষ্টবাদ প্রচারের ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দুনিয়ার প্রায় দেড়শ প্রথম সারির খৃষ্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতাগণ যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দেশের বড় বড় গির্জা, মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গবেষণা এবং বোধ ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খৃষ্টবাদ প্রচারের স্বার্থে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন যে, দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টবাদের বিষাক্ত ট্যাবলেট গলধকরণ করানো নাও যায় তাহলে সমস্যা নেই; কিন্তু কমপক্ষে অতি অবশ্যই মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক স্থলন ঘটানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পঙ্গু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। কনফারেন্সে যোগদানকারী ধর্মনেতাগণ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। যা পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ উগ্র ও চরমপন্থী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে।

মোটকথা, গির্জাপতি আর ধর্মনেতাগণ খৃষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের পথকে সহজ ও সুগম করতে কোন কল্পনা-পরিকল্পনা বাকি রাখেননি। একজন মুসলমানের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে ছিনতাই করা, মুসলিম যুবসমাজের চরিত্রকে নষ্ট করা এবং ইসলামবৃক্ষের গোড়াকর্তন করার – সার্বিক অর্থেই যতো পথ ও পন্থা হতে পারে তারা সব আবিষ্কার করেছে এবং মুসলমানদেরকে সে অনুযায়ী পরিচালিত করেছে। কিন্তু পরিতাপের কথা হলো, মুসলমানরা নিজেদের সঠিক পথ ছেড়ে ইয়াহুদি-খৃষ্টানদের বাতলানো পথে চলতে লজ্জা ও অনুশোচনাবোধ তো দূরের কথা, বরং সেটাকেই গর্ব ও আভিজাত্যের বিষয় মনে করেছে। যারা এ ব্যাপারে সামান্য “নাক গলায়”, তাদেরকে সেকেলে, চরমপন্থী, প্রগতির পথে বাধা ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করেছে।

আপনাদের সামনে একটি রিপোর্ট পেশ করছি, আশা করছি এর দ্বারা আপনি খৃষ্টানদের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান তার তেরতম বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে রয়েছে খৃষ্টান মিশনারিদের অতীত সফলতাসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া। চলতি শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে তাদের কি কি অভিসন্ধি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে কোন পথে এগুতে হবে, কি পরিমাণ অর্থসম্পদ তাতে ব্যয় হবে, কতজন ধর্মপ্রচারক ও মিশনারি এই মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল কি দাঁড়াতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের সামান্য চিত্র তাতে তুলে ধরা হয়েছে। আমেরিকার অরজিনা ভার্সিটির খৃষ্টান প্রফেসর ডক্টর ডিওড বেরিয়েট এ প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত গবেষণা-পর্যালোচনা করার পর মন্তব্য করেছেন –

“নিশ্চয়ই এই প্রতিবেদন দুনিয়াজুড়ে খৃষ্টানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ইঙ্গিত বহন করছে। এ আধিপত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও হতে পারে, আবার হতে পারে চিন্তানৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গনে। খৃষ্টানদের কর্মতৎপরতা ও সফলতার একটি চিত্র দেখুন – শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের এক বছর সময়েই খৃষ্টানরা সারা দুনিয়ায় বাইবেলের ২৮ বিলিয়ন কপি (আঠারশত কোটি কপি) বিতরণ করেছে। আর এ কথা শুনলে তো রীতিমত অবাক হতে হয় যে, গেলো বছর পর্যন্ত পৃথিবীর নামী-দামী বড় বড় লাইব্রেরীগুলোতে যীশু খৃষ্টের নামে লেখা বই-পত্রের সংখ্যা ৬৫৭৫১ এ দাঁড়িয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫৩০৯৪ টি বইয়ের প্রচ্ছদে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট অক্ষরে যীশু খৃষ্টের নাম লেখা আছে।”

ডক্টর বেরিয়েট আরো বলেন, উক্ত প্রতিবেদনে সে সকল অঞ্চলের আলোচনাও এসেছে যেগুলোতে এখনো পর্যন্ত খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছেনি। উক্ত প্রতিবেদনে অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহকে ‘আলিফ’ ও ‘বা’ – এই দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

“আলিফ’ দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল রাজ্য, যেগুলোতে খৃষ্টধর্মের আওয়াজ বিলকুল পৌঁছেনি। আর ‘বা’ দ্বারা সে সকল রাজ্য উদ্দেশ্য, যেগুলো খৃষ্টান রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ও ভৌগলিক দিক থেকে তার সাথে মিলিত। উক্ত প্রতিবেদনে দাবী করা হয় যে, অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহে অনতিবিলম্বে খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভৌগলিক তথ্য, ভাষা ও আঞ্চলিক সব রীতি অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উক্ত প্রতিবেদনের একটি পরিসংখ্যান ছিল এই যে, বর্তমানে অ-খৃষ্টান রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা হলো তের বিলিয়ন। আর এই জনপদগুলোতে বছরে প্রায় ৪৭ মিলিয়ন লোক বাড়ছে। এ হিসেবে দৈনিক ১২৯০০০ নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণ করছে। উনিশ শতকে জনসংখ্যার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র এক মিলিয়ন। এ হিসেবে আশা করা যায়, বিশ শতকে অ-খৃষ্টানদের রাজ্যের জনসংখ্যা ১৪ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫ বিলিয়নে পৌঁছে যাবে। (এডিটেডঃ হিসাবে কোন একটা প্রবলেম হয়েছে, তবে

এটা শিউর যে, “বিলিয়ন” হবে না। হতে পারে মিলিয়নের পরিবর্তে ভুল করে বিলিয়ন লেখা হয়েছে, কিন্তু শিউর না হয়ে কারেঙ্ক করতে পারছি না।)

পৃথিবীর শতকরা ৮১ ভাগ লোক কোন না কোন ধর্ম পালন করে। এ হিসেবে পৃথিবীতে বর্তমানে নাস্তিক বা স্রস্টায় অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা হলো ১১১০ মিলিয়ন। সারা পৃথিবীতে ১৫ হাজারেরও বেশী ধর্মের প্রচলন রয়েছে। আর দিন দিন তো নতুন ধর্মের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এই বৃদ্ধি খৃষ্টানদের ধর্ম প্রচারে বড় বাঁধা। এখন আমরা বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মফলাফল, গির্জার সফলতা ও অন্যান্য সংস্থার কারগুজারী ধারাবাহিক উল্লেখ করবো ইন শা আল্লাহ। যা দ্বারা অনুমান করা সহজ হবে যে, বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

Board of Directors এর প্রস্তাব

আযাদী আন্দোলনের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের Board of Directors গৃহীত প্রস্তাবে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে খোলাখুলি বলা হয়েছে যে, “প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এই জন্যে ব্রিটেনের কাছে সোপর্দ করে, যাতে এতদাঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারিদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। তাই এতদাঞ্চলকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার আশ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।” বর্তমানে এটাই বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে।

মিশনারির স্বরূপ সন্ধান

পৃথিবী জুড়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে তাদের সেবার ছদ্মাবরণে বহুরূপী কর্মকাণ্ড দেখে সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে – “খৃষ্টধর্ম কি আসলেই কোন ঐশী ধর্ম?” তা যদি ঐশীই হয়, তাহলে মিশনারিদের খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে কেন এতো ব্যাপক কৃত্রিমতা, জালিয়াতি, অপপ্রচার ও প্রলোভন? বর্তমানে খৃষ্টধর্মের ধ্বজাধারীগণ বিশ্বব্যাপী শান্তি তথা পাপ মুক্তির জন্য ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তারাই আড়াই শতাব্দী আগে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে। যার ফলে বর্তমান খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রভূমি পাশ্চাত্যেই ব্যক্তি স্বার্থ, বর্ণবাদের উন্মত্ততা, নৈতিক অধঃপতন তথা অনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। খৃষ্টবাদের প্রচারকগণ এদেশেও তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে নানা সূক্ষ্ম কুটচালের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে।

আজ তাই প্রতিটি সচেতন ধার্মিক ব্যক্তির তাদের এই অশুভ ও মানবতাবিরোধী কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যিক। আসুন তাদের রূপ উদঘাটন করি।

মিশনারি শ্রেণীবিভাগ

বিশ্বে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৫৬ টি প্রধান এবং ২৮,০০০ টি উপদল রয়েছে। মূল দলগুলোর মধ্যে দুটো দলই প্রধান – ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। এদের মধ্যে শুধু ধর্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যই নয় বরং মূল ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। তাছাড়া তাদের বাইবেল সংস্করণগুলোর একটির সাথে অন্যটির বহুলাংশেই মিল নেই।

বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক

যদিও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম ছিল সেমেটিক অর্থাৎ প্রাচ্যের, কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরাই এর ধারক-বাহক হয়ে বসেছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্ব জুড়ে গড়ে তুলছে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রচারের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।

প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম

বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশী মিশনারি ক্রুসেডার (ধর্ম যোদ্ধার) শিকার মুসলিম বিশ্ব। এ প্রেক্ষিতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তুলেছে চার্চ ও বিভিন্ন ছদ্মবেশী সেবা, শিক্ষা ও আর্থিক দাতা প্রতিষ্ঠান “এনজিও” সমূহ।

সরাসরি মিশনারির মধ্যে “হ্যাগাই ইন্সটিটিউট” এমন একটি সংস্থা, যার কাজ হলো ধর্মের অসারতা প্রমাণ ও ইসলামের নবজাগরণকে প্রতিহত করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে জার্মান, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ ও ইসলাম বিরোধী বই এদেশে বহু কথিত বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, নাট্যকর্মী, কণ্ঠশিল্পী এবং প্রগতিবাদীদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। “হ্যাগাই ইন্সটিটিউট” ২০০০ অ্যালুমিনাই (সদস্য) নিয়ে ৫ টি মহাদেশের ৭০ টি প্রদেশে ১,০০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে দক্ষ প্রচারকরূপে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে ১,২০,৮৮০ টি প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশে প্রটেষ্ট্যান্ট গোত্রের ইয়াং খৃষ্টান ওয়ার্কস এবং এভরী হোম কান্ট্রাস্ট, খৃষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপম্যান্ট ইন বাংলাদেশ (সি. সি. ডি. বি.) ইয়াং ম্যানস খৃষ্টান এসোসিয়েশন (ওয়াই. এম. সি.) উল্লেখযোগ্য। তারা বাংলাদেশের নানা স্থানে বিভিন্ন নামে অসংখ্য সংস্থা স্থাপন করেছে।

প্রকাশনা

বই প্রচার ও পত্রাদি বিলি

উল্লিখিত আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে জানা যায়, খৃষ্টধর্ম বিষয়ক ১ লাখ ৯ হাজার ৯ শত ধরনের বই ও একত্রিশ হাজার তিনশত রকম ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে বিনামূল্যে বিলিকৃত বাইবেলের সংখ্যা প্রায় ৬৩ কোটি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামী পরিভাষায় রচিত বাইবেল অর্থাৎ “কিতাবুল মুকাদ্দাস” আঠারো কোটি তিরিশি লক্ষ তিরিশি হাজার। সর্বোপরি খৃষ্টবাদ, ইউরোপীয় ধর্মদর্শ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘণ্যতম মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে চলেছে। ১৬ ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং সনে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এডওয়ার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজার রকম বই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ভিডিও, অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা এবং “স্বর্গমত ম্যাগাজিন” উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশনায় অপকৌশল

ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন

মিশনারিরা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সারা বিশ্বে বাইবেল নামেই বহুল পরিচিত। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে নাম পরিবর্তন করার কৌশলে খৃষ্টান মিশনারিদের জুড়ি নেই। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় খৃষ্টানরা বাইবেলকে “ধর্ম পুস্তক” নামে ১৯৬৩ সালে “পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি” থেকে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে একই সংস্থা “বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি” (বি. বি. এস.) তাদের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে “পবিত্র বাইবেল” নামে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, উভয় নামের বাইবেলে (তথাঃ ধর্ম পুস্তক – ১. “বাংলাদেশ বাইবেল”, ২. “পবিত্র বাইবেল”; মৌলিকভাবে দুটো অংশ রয়েছে – ১. “নতুন নিয়ম”, ২. “পুরাতন নিয়ম”) পরবর্তীতে সংস্থার নাম পাল্টিয়ে “মসীহী জামাত” নামকরণ করে তাদের পবিত্র বাইবেলকে “কিতাবুল মুকাদ্দাস” নামে প্রকাশ করে। এই কিতাবুল মুকাদ্দাসে “পুরাতন নিয়ম” অংশের নামকরণ করেছে “তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাব” এবং “নতুন নিয়ম” অংশের নামকরণ করেছে “ইঞ্জিল শরীফ”। প্রমাণ্য ঐতিহাসিক সত্য হলো, ওসব নামের তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ’র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অবিকৃত কিতাব নয়।

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল

খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের “কিতাবুল মুকাদ্দাস” ও “ইঞ্জিল শরীফ” এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামী খাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদিসগ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আরবি বর্ণের শৈল্পিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করেছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন পর্দা, নামায, নারী শিক্ষা, ওয়ু ইত্যাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে।

ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার

খৃষ্টান মিশনারিরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামী পরিভাষা, শব্দ ও নামাবলী চুরি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও বইগুলো প্রকাশ করে চলেছে। তাদের পবিত্র বাইবেলের কিছু শব্দ উল্লেখ করা হলো, যে শব্দগুলোকে তারা তাদের গ্রন্থ কিতাবুল মুকাদ্দাসে ইসলামী পরিভাষা ও নামের রূপ দিয়েছে (কিতাবুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তিত রূপ ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা হলো) –

আদিপুস্তক (আল-তৌরাত), প্রথম সিপারা (পয়দায়েশ), পরমগীত (নবীদের কিতাব সোলায়মান), গীতসংহিতা (আল জবুরঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সিপারা), ঈশ্বর (আল্লাহ), ঈশ্বর পুত্র (ইবনুল্লাহ), পরিত্রাণ (নাজাত), ভাববাদী (নবী), ভজনা (এবাদত), বিশ্বাস (ঈমান), ব্যবস্থা (শরীয়ত), আব্রাহাম (ইব্রাহীম), মোশি (মুসা), দায়ুদ (দাউদ), যীশুখৃষ্ট (ঈসা মসীহ), দূত (ফেরেশতা), শির্ষ (সাহাবী), প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা), উবড় (সিজদা), যাচঞা (মুনাজাত), অলৌকিক কার্য (মোযেজা) ইত্যাদি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি

সর্বোপরি তাদের নির্লজ্জ ও জঘন্যতম জালিয়াতির দৃষ্টান্ত হলো দীর্ঘ ১৬ বছর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত চুরি করে প্রতিটি অধ্যায়ে আরবিতে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” দিয়ে শুরু করে তাদের কথিত ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের কোন কিছু শুরু করা হয় “পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা” এর নামে। বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের নামে এতো বড় জালিয়াতির নজির আর নেই।

পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা

ইদানিং তাদের ঘৃণ্য প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী চরমে পৌঁছেছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ এবং নিজেদের মনগড়া বানোয়াট অনুবাদ ও বাইবেলের স্বপক্ষে অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকম পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার করেছে। যেমন ত্রিত্ববাদের মাঝে আল্লাহ এক, ইঞ্জিল ও কুরআনে ঈসা কালিমা তুল্লাহ’র ব্যক্তিসত্তা রক্তমাংসের দেহে আবৃত, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি ?

তারা এখন তাদের বইয়ে সরাসরি কুরআনের আরবি আয়াত সংযোজন করেছে।

মুসলমানরা কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে বলে তাদের ঘরে মিশনারিদের রচিত বই-পুস্তক স্থান পায়। কালার সমৃদ্ধ তাদের এ বইগুলো পড়ে সরল মনের সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এবং ঈমান আমল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরে। এভাবে মিশনারিগুলো তাদের (ঈমান ধংসের) লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।

তাদের প্রত্যেক বইয়ের শেষে প্রশ্নপর্ব থাকে। সেগুলোর উত্তর প্রদানে আরো বই ও উপহারের আশ্বাস দেওয়া হয়। বইয়ের বিকৃত বিষয়ের কোন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। তবুও কেউ প্রশ্ন করলে তারা নীরবতার কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে যে কোন মূল্যে পাঠক থেকে মিথ্যার সাক্ষ্য নিয়ে কুফরীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

এলাকা ও জনগণ নির্ধারণ

তারা সমগ্র বাংলাদেশকে প্রচারের আওতাভুক্ত করার জন্য ১৯৬৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা মহাপ্রদেশের অধীনে পুরো পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে, এগুলো হলো –

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশঃ এ ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত এলাকা প্রদেশের সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এ ধর্মপ্রদেশ। এ ধর্মপ্রদেশের পরিধি যমুনা নদীর পশ্চিমাঞ্চল তীর থেকে দক্ষিণে পদ্মা এবং পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত।

খুলনা ধর্মপ্রদেশ।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ।

এ সকল এলাকায় তারা সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। আর হবেই না কেন ? তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বিশাল অর্থের যোগান। ১৯৯৭ সালে খ্রিস্টবাদের প্রচার সংস্থাগুলোর মধ্যে শুধু ওয়ার্ল্ড ভিশনের অর্থ পরিকল্পনা ছিল ২১২৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার।

নকল ইমাম তৈরি

তারা গোপনে খৃষ্টান দেশগুলোতে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরি করে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাদ্রীদের সম্মেলনে “জবাজ” নামক এক পাদ্রী বিশেষ সভায় সভাপতিত্বের ভাষণে বলেনঃ মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা তাদের পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছি। এটা আমাদের সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং আমাদের সবাইকে দেশে বিদেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইসলামী নাম ধারণ

তারা এখন ইসলামী কায়দায় নাম রাখতে শুরু করেছে, যেমন – আবদুল ওয়াহহাব, সুলতান আহমেদ পৌল ইত্যাদি। তারা আরো একধাপ এগিয়ে নিজেদের খৃষ্টান পরিচয় না দিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় ঈসায়ী মুসলমান। তারা কালিমাও বানিয়েছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা মসীহুল্লাহ।

যুবতী প্রচারক

খৃষ্টান মিশনারির নারী সদস্যরা তাবলীগের ছদ্মবেশে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষিত খৃষ্টান নারীরা (ধর্মান্তরিত করার) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, যাতে পরবর্তী জেনারেশনকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে। কারণ স্বামী মুসলমান হলেও পরবর্তী জেনারেশনই তাদের টার্গেট। এমনকি মহিলা ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে তারা ধর্মপ্রচার করে থাকে।

কারগুজারিঃ

লোমান তপন, পিতা মরটিন তপন। চকবানারসি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজাতি খৃষ্টান, অর্থাৎ তিনি পূর্বে উপজাতি ছিলেন, বর্তমানে তিনি খৃষ্টধর্মাবলম্বী। তিনি জানান, চকবানারসি অঞ্চলে “নিচপাড়া মিশন” এর প্রচেষ্টায় প্রায় ৫ শত পরিবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

নিচপাড়া মিশনটি এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবার আড়ালে ধর্মান্তরিতকরণের কাজে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। এটি ইটালিয়ান মিশন। এখানে দুজন ফাদার ও চারজন সিস্টার সার্বক্ষণিকভাবে মিশনের দায়িত্ব পালন করছেন। এ মিশনটি বীরগঞ্জ থানার উত্তরে, প্রায় তিন মেইল ভিতরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। বিশাল জায়গা নিয়ে এর অফিস ভবন, গির্জা ও মিশনারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়াও মিশনের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে চাকরিদানের লোভনীয় টোপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, খৃষ্টান মিশনারিগুলোতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে চাকরি মিলে না। চাকরির প্রলোভনে পড়ে অনেক মুসলমান বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলেও ভিতরে ভিতরে পুরোদস্তুর খৃষ্টধর্মনিষ্ঠ। মুসলমান ছেলে-সন্তানদের খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য মিশনারিগুলোতে প্রায়শই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আকর্ষণীয় কর্মসূচী পালন করা হয়। এসব কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের মুসলমান সন্তানরা নিয়মিত মিশনে যাতায়াত করছে। ফলশ্রুতিতে নতুন প্রজন্মে খৃষ্টানিজম মানসিকতা গড়ে উঠছে।

এই তো এই বছরের শুরুর দিকে একদিন বীরগঞ্জ উপজেলার শহর থেকে ভ্যানে করে বাড়িতে ফিরছিলাম। মেইন রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ছোট ছোট মাটির ঘরের এক বিস্তীর্ণ মহল্লা। মহল্লাটি সাঁওতালদের। হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে মহল্লার মাঝে নতুন একটি ঘর, সেখানে কিছু ছেলে মেয়ে সারিবদ্ধভাবে হাঁটুতে ঠেক দিয়ে কি যেন বলছে, আমার কৌতূহল সৃষ্টি হলো। কারণ ইতিপূর্বে এমনটি কখনো দেখিনি, যদিও আমার যাতায়াত সাধারণত এ পথেই হয়ে থাকে। ভ্যানগাড়ি থামিয়ে সেখানে গেলাম আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কি হচ্ছে। লোকটি উত্তরে বললো – উপাসনা হচ্ছে। আবার প্রশ্ন করলাম – কিসের উপাসনা। সে বললো – ক্যাথলিকদের উপাসনা। ক্যাথলিক ! ক্যাথলিক তো খৃষ্টান। সে বললো – আমরাও তো খৃষ্টান। আমি বললাম – আপনারা তো খৃষ্টান ছিলেন না, আপনারা তো সাঁওতাল। কতদিন আগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

মাদারগঞ্জে কয়েক হাজার খৃষ্টান

৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইং তারিখে মাদারগঞ্জের তেঘুরিয়া ইউনিয়নে আমাদের সফর হয়। সেখানে পৌছার পর স্থানীয় এক খৃষ্টান হাফেজ এসে আমাদের বললেন, আমাদের এখানকার প্রবীণ / মুরব্বী (যিনি ধর্মান্তরিত খৃষ্টান) আপনাদের সাথে কথা বলতে চান। তখন আমি অধম, বন্ধুবর মাওলানা নুরুল ইসলাম ও ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামসহ তার কাছে যাই। গিয়ে দেখি জালাল সাহেব আসন দিয়ে বসে আছেন। সামনে বিছানার উপর ছড়ানো পবিত্র কুরআন, যেন এ কোন সাধারণ বই-খাতা ! আর ডায়েরি দেখে তাতে কি যেন দাগাচ্ছেন। আমরা সালাম দিয়ে প্রথমে কুরআন শরীফটি বিছানা থেকে বুকে উঠিয়ে নিলাম। এরপর তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা হলো। তার আলোচনার বিষয় ছিল মিশনারিগুলোর শিথিয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলো। আমরা তার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতে লাগলাম, তিনি আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তাদের বস (খৃষ্টান মিশনারিদের প্রধান) জাহাঙ্গীর আলম ওরফে লেবু ডাক্তারকে ফোন করলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তরজমাতুল কুরআন, কিতাবুল মুকাদ্দাস ও কিছু নোট নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সাথে কিছুক্ষণ যুক্তিতর্কের পর বললাম, তর্ক কিংবা বিতর্ক কোনটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সত্যকে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই আপনার প্রতি আহবান থাকবে, পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসবেন।

মসজিদের খতীব খৃষ্টান

২০০৯ সালে এক সফরে লালমনিরহাটের আদিতমারি থানায় যাই। সেখানে যাওয়ার পর এলাকার মানুষ জানালো যে, আমাদের এলাকায় একজন খতীব সাহেব আছেন যিনি মসজিদে জুমআর খুতবায় এমন কিছু কথা বলেন, যা আপত্তিকর। তিনি বলেন, নামায পড়তে পড়তে যদি কারো কপালে দাগ পড়ে যায় তবুও সে জাহান্নামে যাবে। খতীব সাহেব আরো বলেন, কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমন ঘটবে। তখন তো তাকে মানতে হবেই। তাহলে এখন মানতে অসুবিধা কোথায়? আরো বলেন – মাটির নিচের নবী উত্তম না আসমানের উপরের নবী উত্তম? যিন্দা নবী উত্তম না মৃত নবী উত্তম ইত্যাদি। আমরা যখন খতীব সাহেবের ব্যাপারে অনুসন্ধান করলাম, জানা গেলো তিনি আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সক্রিয় সদস্য। আর আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট হলো খৃষ্টান মিশনারির ছদ্মবেশী একটি সংস্থা। সেবার আবরণের খৃষ্টধর্ম প্রচারই যাদের মূল লক্ষ্য। সেখানে সেকান্দার মাস্টার নামে আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ হলো, যিনি একটি মসজিদের সভাপতি। তিনি আমাদেরকে কুরআনের উপর উত্থাপিত খৃষ্টানদের শিখানো বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেগুলো দিয়ে তারা সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত করে থাকে।

বিনাইদহে মুরতাদদের সাথে একদিন

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভগবান গড় গ্রামের (শৈলকূপা থানা বিনাইদহ) সফরের কথা বলি। এ সফরে আমাদের রাহবার ছিলেন স্থানীয় কলেজের ছাত্র রাকিবুল ইসলাম ভাই। গিয়ে দেখি সেখানের অনেক মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে। খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত স্থানীয় ঠাণ্ডামাতবর, এলাহী বখশ, বাদশা মিয়া আরো অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাদের সাথে কথাবার্তা চলছিলো। এক পর্যায়ে আমাদের আলোচনা মুনাজারার (বিতর্কের) রূপ নেয়, তবে তারা মুনাজারায় পরাজিত হয়। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী তাদের একজন দাঈ “অমূল মাধুর্য” এর (যে ঐ এলাকায় ইয়াং সোসাইটির প্রধান) সাথে আমার খাতির জমে যায়। আমি তার দাওয়াতি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা বই পুস্তক বিলি করি, বুঝাই আর আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে দাওয়াত দেই। আমি ফের প্রশ্ন করলাম, আপনারা বই পুস্তকের টাকা পয়সা কোথায় পান? উত্তরে বললেন, আমরা প্রত্যেকেই আয়ের এক দশমাংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করি এবং দান করার পর সেদিকে ফিরেও তাকাই না। কেউ আমাদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাকেও এই দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। আমাদের দাওয়াতি কাজের অর্থযোগান এভাবেই হয়। আর এভাবে সংগৃহীত টাকা দিয়েই আমরা বই পুস্তক কিনি আর বিতরণ করি। আমূল মাধুর্য জানালেন, তিনি একটি প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করেন। সেখানে মুসলমানের সন্তানরাও পড়াশুনা করে। তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা নয় বরং খৃষ্টধর্মের দীক্ষা দেওয়া হয়। সেকুলার পদ্ধতিতে পড়ানো হয়। তিনি এ ধরনের বহু তথ্য দিলেন।

আমি মুসলিম ভাইদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমরা কয়দিন কয়টি বই আমার প্রতিবেশী অমুসলিমের হাতে তুলে দিয়েছি? আমরা কতোভাবে আমাদের টাকা খরচ করি, একটি টাকাও কি অমুসলিম ভাইদের পিছনে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে খরচ করেছি?

মুসলমানদের গ্রামে খৃষ্টানদের চার্চ

খবর পেলাম, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানায় বহু মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে, তাই ঐ অঞ্চলে সফর করি। প্রথমে মেলান্দহ জামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে সম্মানিত মুহতামিম, মুফতি শামসুদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমরা উভয়ে মাদারগঞ্জ থানার তেঘুরিয়া ইউনিয়নের কয়লাকান্দি গ্রামে পৌঁছি। সেখানে মুসলমানদের এলাকায় ন্যাজরিয়ান মিশনের একটি বিশাল গির্জা দেখতে পেলাম। ঐ এলাকার অনেক মুসলমানই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার দাওয়াত দেই। অনেকে বাইবেল ও কিতাবুল মুকাদ্দাস ফেরত দিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসেন এবং তাওবা করেন। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। অথচ তাদেরকে হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামান্য অনুভূতিও আমাদের হয় না।

মুসলমানের সন্তান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চিনে না, মেরী ও যীশুকে চিনে !

বারিধারা নতুন বাজারের পিছনে একটি বড় বস্তি আছে। একদিন বিকালে বন্ধুবর মাওলানা মুজিব সাহেবসহ ঐ এলাকায় ঘুরছিলাম। চোখের সামনে পড়লো একটি স্কুল, সাথে গির্জা। স্কুলটি দেখে আমাদের কৌতূহল হলো।

স্কুলের সামনে ১০ / ১২ বছর বয়সের কয়েকটি ছেলে খেলাধুলা করছে। একজনকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে “রাকিবুল ইসলাম” বলে উত্তর দিলো এবং এও জানতে পারলাম যে, সে এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। তাকে কালেমা জিজ্ঞাসা করলে “পারি না” বলে উত্তর দেয়। এবার আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে বললো “জানি না”। এবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মেরী বা যীশুকে চেনো ? সে উত্তর দিলো – হ্যাঁ, চিনি। আবার জিজ্ঞাসা করলাম – কিভাবে চেনো। সে বললো, আমাদের স্যার আমাদের শিখিয়েছেন।

দেখুন, আমাদের উদাসীনতার সুযোগে আমাদের সন্তানদেরকে তারা খৃষ্টান বানাচ্ছে। এটাই হলো তাদের সেবার আসল রূপ।

খৃষ্টানদের চ্যালেঞ্জ

রমযানুল মুবারাকের শেষ দিনগুলোতে ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে বাড়ি যাওয়ার ধুম পড়ে। আমি দুজন নওমুসলিমকে নিয়ে আমার বাড়ি দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা কমলাপুর স্টেশনে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। রিসিভ করে সালাম বিনিময়ের পর বুঝতে পারলাম, ফোন করেছেন মাওলানা রায়হান সাহেব (সম্ভবত তিনি জামিয়া নূরিয়া কামরাঙ্গির চর মাদরাসার দারুল ইকামা হোস্টেল পরিচালক)। তিনি বললেন – যুবায়ের ভাই, কয়েকদিন ধরে ফোন করছি, আপনাকে পাচ্ছি না। মাওলানা ওমর আলী সাহেবকেও পাচ্ছি না। আমি বললাম, হজুর তো উমরার সফরে গিয়েছেন। এবার বলুন, কি খেদমত করতে পারি? তিনি বললেন – আমাদের মাদ্রাসার এবতেদায়ী শ্রেণীর এক ছাত্র নাজিবুর রহমান জানালো, তাদের এলাকায় খৃষ্টানরা চ্যালেঞ্জ করেছে যে, আমরা তোমাদের কিছু প্রশ্ন করবো, যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর দিতে ব্যর্থ হও, তাহলে তোমাদেরকে খৃষ্টান হতে হবে। এলাকাবাসী উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে এই এবতেদায়ী ছাত্রের কাছে এসেছে। কারণ সে-ই ঐ এলাকার বড় হজুর। এখন ছেলেটি এ বিষয়ে আমাদেরকে জানিয়েছে। যেহেতু দীর্ঘদিন আপনারা খৃষ্টান মিশনারির তথ্য অনুসন্ধান ও তাদের অপতৎপরতা প্রতিরোধের সাথে জড়িত, তাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন কি? আমি বললাম, অবশ্যই। ইন শা আল্লাহ।

আমি ঐ ছেলের নাম, মোবাইল নাম্বার ও পূর্ণ ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। জানতে পারলাম, স্থানটি হলো দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থানা। বিষয়টি নিয়ে ভাবতেই আমার খুব কান্না পেলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে বাস করে সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারী হয়ে মিথ্যার উপর ভর করা ভিত্তিহীন, বিকৃত ধর্মানুসারীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়! এর জন্য আমরাই দায়ী। দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে।

যাই হোক, ২৮ রমযানে বাড়ি ফিরলাম, চিন্তা – ঈদের আগের দিনই যাবো। ফোনে যোগাযোগ করে ঈদের পর তৃতীয় দিন বিতর্কের তারিখ ঠিক হলো। তৃতীয় দিন সকাল সকাল আমি বীরগঞ্জ থেকে রওনা হলাম, বন্ধু সারওয়ার ও ইমরান ভাইসহ সেই অজপাড়া গায়ে পৌঁছলাম।

সেই এলাকায় খৃষ্টান মিশনারি “ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থা” এলাকার মহিলাদের গরু, ছাগল ঋণ দেয় এবং প্রতি মাসে পশুপাখি কিভাবে লালন-পালন করবে তারও প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণেরই এক পর্যায়ে কুরআনের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নের তৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং গ্রাম্য সরলমনা মহিলাদের এ বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে যে,

যদি তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো, তাহলে অফিসের আমরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর না দিতে পারো তাহলে তোমরা সকলেই খৃষ্টান হয়ে যাও। সেই মহিলারা মাদ্রাসার ছাত্র নাজিবুর রহমানকে প্রশ্নগুলো জানালো।

আমাদের আগমনে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ঢাকা থেকে উলামায়ে কেরামের আগমন টের পেয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশনের লোকেরা হতচকিত হয়ে পড়লো। বহু চেষ্টা করেও তাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মোবাইলও ছিল বন্ধ।

এ হলো মিশনারিগুলোর অবস্থা। মুখে মুখে সেবার মোহনীয় শ্লোগান। এর আড়ালে জনগণের সরলতার সুযোগে ধর্মান্তরের চেষ্টা। এ ব্যাপারে এখনই সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য।

কুড়িগ্রামে মিশনারিদের অপতৎপরতা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের শেষ দিকে একটি জেলার নাম কুড়িগ্রাম। আয়তন ২২৪৫.০৪ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২২৫০৯৭৪ জন। উপজেলা ৯ টি, ইউনিয়ন ৭২ টি, গ্রাম ১৮৭২। বেশ বড় একটি জেলা হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়নের ছোঁয়া তেমন পায়নি। এ জেলারই একটি গ্রাম চিটপাইকেরছড়া। যা ভুরুঙ্গামারী উপজেলার একেবারেই শেষদিকে ভারত সীমান্তের কাছে। দুর্গম ও উলামায়ে কেরামের পদচারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ধর্মান্তরকারী এনজিওগুলোর অপতৎপরতার অনুকূল জায়গা। অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যে জর্জরিত উত্তরের অনেক জনপদের মত চিটপাইকেরছড়াতেও প্রবেশ করেছে ঈমান হরণকারী একটি এনজিও। প্রেস ভেটেরিয়ান চার্চ অব বাংলাদেশ নামে এ এনজিওটি ২০০০ সাল থেকে সেবার খোলসের নিচে তাদের নোংরা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ধর্মান্তরকরণের লক্ষ্য হাসিলের জন্য তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুল নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পল্লী সমাজে নিরক্ষতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মোহনীয় শ্লোগানের আড়ালে অব্যাহত রেখেছে ঈমান লুটের ধারা।

তাদের আরেক শিরোনাম স্বাস্থ্যসেবা। এ শিরোনামে নামি-দামি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সেই পল্লিতে হাজির করা হয়। এভাবে নানা শিরোনামে ষোল বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এনজিওটি এই গ্রামের প্রচুরসংখ্যক মুসলমানকে খ্রিস্টানে পরিণত করে, যার একটি অংশ প্রকাশ্যে খ্রিস্টান পরিচয় দিত আরেক অংশ পরিচয় গোপন রাখত। এ কারণে সুনির্ধারিতভাবে সংখ্যা বলা মুশকিল। তবে প্রতি রবিবারে গীর্জায় উপস্থিতির সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছিল।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালের বিশ্ব ইজতেমা থেকে বিশোধিক সাথীর একটি জামাত নিয়ে ঢাকার প্রসিদ্ধ একজন হাটের ডাক্তার ভুরুঙ্গামারী সফর করেন। তার বর্ণনা শুনেই আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাহলে তার না জানি কী হয়েছে। চিল্লার ১৭ দিন

তারা একই মসজিদে দিনে ঘাম ঝরিয়েছেন আর রাতে অশ্রু ঝরিয়েছেন। আর ভেবেছেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে কীভাবে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, যে উম্মতের জন্য তিনি নিজ আত্মীয়-স্বজন মাতৃভূমি সবই ত্যাগ করেছেন। মা যেমন তার সন্তানের জন্য সব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য তার চেয়ে বেশি উৎসর্গ করেছেন। মায়ের বুক খালি করে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিলে যদি আপনি ব্যথিত হন তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে ছিনিয়ে নিলে কেন ব্যথা জাগবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার জান-মাল পিতা-মাতা ও সন্তানাদির চেয়েও প্রিয় না হব।”

ঈমান যা এক মুমিনের মহা মূল্যবান সম্পদ যা রক্ষা করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন; তাঁদের গলায় রশি বেঁধে অলিগলিতে টানা হত, মরুভূমির উত্তপ্ত পাথুরে জমিনে শায়িত করে বুকে পাথর চাপা দেয়া হত- সেই মহাসম্পদ চিটপাইকেরছড়া গ্রামে ৫০০/১০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতার সংখ্যাও একেবারেই কম নয়।

বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এই গ্রামটি যিয়ারতের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছিল না। অবশেষে গত ত্রৈমাসিক পরীক্ষার সময় ছবক স্থগিত হলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এবার ইনশাআল্লাহ এই গ্রাম সফর করব।

এই গ্রামে প্রথম যারা দাওয়াত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেব তাদের অন্যতম। এবারের সফরে তিনি কিছু সাথী নিয়ে একটি গাড়িতে আর আমরাও কিছু আহবাবকে নিয়ে আরেকটি গাড়িতে আল্লাহর নামে সফর শুরু করি। ৫/১১/১৬ সকাল ৬.০০ প্রথমে কাকরাইল মসজিদে গেলাম, সেখান থেকে শহীদুল ইসলাম ভাইকে নিয়ে বার ঘণ্টার রাস্তা পার হয়ে রাত ৭.০০ কুড়িগ্রাম পৌঁছলাম। সফরসঙ্গী ৬ জন। খাবারের পর চিটপাইকেরছড়া গ্রামের একটি মাদরাসায় গিয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে এলাকার খোঁজ-খবর পাওয়া গেল।

‘প্রেস ভেটেরিয়ান চার্চ অব বাংলাদেশ’ নামে একটি এনজিও ২০০০ সালে এখানে কাজ শুরু করে। এর প্রধান বেচাং ওয়ার্ড আইউব। বাড়ি চট্টগ্রাম। সেও একজন ঈমান বিক্রেতা, এখন সওদাগর। গাজিপুর জেলার মিকি পাড়ায় এর প্রধান কার্যালয়।

জামালপুরের মাদারগঞ্জ, বরিশালের গলাচিপা, ময়মনসিংহের গরিপুরসহ নেত্রকোণা, কুষ্টিয়া ও মানিকগঞ্জে এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

এরা এদের কার্যক্রমকে তিনটি শিরোনামের অধীনে পরিচালিত করে : ১. শিক্ষা-প্রোগ্রাম ২. কৃষি প্রোগ্রাম ৩. ধর্মীয় প্রোগ্রাম। এরা এই গ্রামে ২০০৪ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সরকারী নিবন্ধের আওতায় নিয়ে আসে। ২০০৬ ঈ. এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুলে ক্লাস শুরু হয়।

এই সালেই গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে। গীর্জার উপরে লেখা আছে ‘অসহায় ছিন্নমূলদের সেবায় নিয়োজিত’। গীর্জায় লেখা এই বাক্যটি তাদের সেবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য পরিষ্কার বর্ণনা করছে। সেবার শিরোনামে ধর্মান্তরিতকরণই যে এদের প্রধান কাজ এতে লুকোছাপা কিছু নেই। আজাদ ফকীর নামে এক লোক এদেরকে এই গ্রামে নিয়ে আসে। তার জমিতেই খ্রিস্টানরা স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করে। জহুরুল নামে এক লোক এখানে এই গীর্জার রক্ষণাবেক্ষণ করত। ১৯৯২ সালে সে এদের দলভুক্ত হয়। মহান আল্লাহর শোকর, তিনি এই আজাদ ও জহুরুলকে হেদায়েত দিয়েছেন। শত বারের উপর গাশত করার পর গত কয়েক মাস আগে দুজনই ইসলাম কবুল করেন।

ধর্মান্তরিতের তুফানসম ফিতনা দেখে আমরা অনেক সময় হাল ছেড়ে মূসা আলাইহিস সালামের কওমের মত বলি, আমাদের কিছু করার দরকার নেই। আল্লাহর দীন আল্লাহই রক্ষা করবেন-

اَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ .

তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর আমরা এখানে বসে থাকব।’

মনে রাখতে হবে এই একটি চিন্তাই এ উম্মতের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

২০১৪ সালে মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেব তার অতি সাধারণ এক ছাত্র মাওলানা শামীমকে সাল লাগানোর পর এখানে দাওয়াতের এই কাজে পাঠিয়ে দেন। আমি নিজেও কয়েকজনকে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। শামীমের ইলম, বয়ান, উপস্থাপনা কোনটাই উল্লেখ করার মত ছিল না। তার চেয়ে অনেক যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র আমাদের আশেপাশে ঘুরছে কিন্তু যে কাজ আল্লাহ পাক শামীমকে দিয়ে করিয়েছেন তা দায়ীদের জন্য স্মরণীয় পাথেয় হতে পারে। খুব সংক্ষেপে বিষয়টি তুলে ধরছি :

১. ইরতেদাদের ফেৎনা এখানে এক ভয়াবহ তুফানের রূপ ধারণ করেছিল। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সে তুফান থামিয়ে এখন ঈমানী সুবাতাস প্রবাহিত করেছেন। ফলে এ পর্যন্ত ৪২ জন খ্রিস্টান ইসলাম কবুল করেছে। পরিচয় গোপন রাখা কিছু পথহারা মুসাফির এখনও ঘরে ফিরতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা ৪২ জন ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২. দাওয়াতের মেহনতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এক বিশাল সফলতা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। যার প্রমাণ হল ৫/১১-এর মাহফিলে প্রায় ১০ হাজার পুরুষ ও ১২ হাজার (আনুমানিক) মহিলা শরীক হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে সময় লাগিয়েছেন? সবাই হাত উঠাল। স্টেজে বসা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব নূরুন্নবী সাহেবও তিন দিন লাগিয়েছেন। দুই বছরে মাওলানা শামীম ৫৭ জনকে চিন্তায় বের

করেছে। যার কারণে এখন মসজিদভর্তি মুসল্লী ও মজলিসভর্তি দ্বীনদার শ্রেণি। আর মাদরাসাভর্তি তালিবুল ইল্ম, যা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

৩. শিক্ষা কার্যক্রম হচ্ছে যে কোনো আদর্শের অন্যতম মূল বাহন। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করলে সেখানে মুয়াল্লিম পাঠিয়ে দিতেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের মাশায়েখ মক্তবের উপর খুব জোর দিতেন। সে চিন্তা করেই চিটপাইকেরছড়া গ্রামে দুই বছর আগে একটি মাদরাসা কায়ম করা হয়েছে। যেখানে ২৫০ শিশু পড়াশুনা করে। এদের মধ্যে ১০৪ জন এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্র এবং ঈমান ছিনতাইয়ের ফাঁদের শিকার মুসলমানদের সন্তান। ৬/১১/১৬ ঈ. রবিবার সকালে আমরা শিশুদের নিয়ে বসলাম। দ্বীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে শিশু উপযোগী কিছু আলোচনা হল। তারপর দুআ হল। মুসলমানকে গীর্জায় নিয়ে প্রার্থনা করানোর কথা শুনে হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল সেই রক্তই যেন তপ্ত অশ্রু হয়ে প্রবাহিত হল।

মাদরাসার জন্য একজন নতুন চিল্লার সাথী প্রায় এক বিঘা জমি দান করেছেন। ৭.৭ ফুট গর্ত ছিল। ২১৬০০০ টাকার মাটি সেখানে ফেলা হয়েছে এবং টিন দিয়ে চারটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। ঐ ঘরগুলোতেই ২৫০ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। রবিবার সকালে আমাদের আরও তিনটি মজলিস হয়েছে। একটি সফরের সাথীদের নিয়ে। যে মজলিসের উদ্দেশ্য ছিল, তারা যে মুসলমানদের খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলেছে- এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী। দ্বিতীয় মজলিস এলাকার গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে। সেখানে মূলকথা ছিল, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করলে আল্লাহ তাআলা তাকে কীভাবে পুরস্কৃত করেন। তৃতীয় মজলিস ছিল শিক্ষকদের সাথে। সেখানে মূলকথা ছিল, একটি পণ্য ফ্যাক্টরী থেকে যে রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বের হয় সেই রূপের আর পরিবর্তন হয় না। মাদরাসা হচ্ছে ঈমানদার তৈরির ফ্যাক্টরী, এখান থেকে একজন ছাত্র যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বের হবে, শেষ দিন পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ সে অবস্থায়ই থাকবে। তারপর আমরা কুড়িগ্রাম তাবলীগী মার্কায়ে এসে সকালের নাস্তা সারলাম। এরপর ঢাকায় রওনা করে রাত ১১. ৩০ মি: বাসায় পৌঁছলাম। কুড়িগ্রামে রাস্তার পাশে অসংখ্য মসজিদ চোখে পড়ে, যা আরবদেশের বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করেছে। কিন্তু মসজিদ পাকা করার সাথে সাথে মুসল্লি পাকা করার মেহনত না থাকায় মসজিদগুলোতে প্রাণের স্পন্দন নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মসজিদ কাঁচা ছিল মুসল্লি পাকা ছিল, আমাদের মসজিদ পাকা কিন্তু আমরা মুসল্লিরা কাঁচা। রাতে যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছিলাম তখন দেখেছি মাদরাসা ও মাহফিল নিয়ে ধারণাতীত উৎসাহ-উদ্দীপনা। আর পুরা রাস্তায় জনস্রোত। মাহফিলের শামিয়ানা পরিণত হয়েছিল সকল স্রোতের মোহনায়। একজন মা যদি প্রসব বেদনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না হন তাহলে একটি শিশুর জন্মও হয় না, কারো মুখে হাসিও ফোটে না। এখানেও একজন

দায়ীকে ‘প্রসববেদনা’ সহ্য করতে হয়েছে, যার ফল সবার মুখের হাসি। ১৩/৪/২০১৪ সালে এই গ্রামে এসে তাকে যাযাবরের মত ১৩টি মাস কাটাতে হয়েছে রাতে চোখের পানি দিয়ে বুক ভাসিয়েছেন আর দিনে আল্লাহু পরিশ্রম করেছেন। এইভাবে ১৩ মাস মেহনতের পর মাদরাসার জায়গার ব্যবস্থা হয়।

এই গ্রামের পাশেই রূপকুমার নদী। খ্রিস্টানরা কাউকে খ্রিস্টান বানাতে চাইলে এই নদীতে তাকে গোসল করাত। এই গোসলের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করত। এই কাজকে তারা ব্যাপটিজ বলে। আরবীতে-استصباح বলে। একজনকে এনে গোসল দেয়াতে পারলে ১০০০০ হাজার টাকা দেয়া হত। এটা তাদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা মুসলমানদের বক্তব্য।

উপায়-উপকরণ ছাড়া কেবল আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বত আর এখলাসের মধ্যে আল্লাহ যে কত শক্তি রেখেছেন- চিটপাইকেরছড়া গ্রামটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গত নভেম্বর মাসের শুরুতে এনজিওপ্রধান কুড়িগ্রাম জেলার ডাকবাংলোতে গিয়েছেন, গিয়ে যখন শুনলেন তার পাতা জালে আর মাছ ধরা পড়ছে না তখন চরম হতাশা প্রকাশ করেন। আর কোটি কোটি টাকার লস প্রজেক্ট দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কুড়িগ্রাম থেকে বিদায় নেন।

আসলে এই উন্মত্তের বড় প্রয়োজন কিছু উৎসর্গিতপ্রাণ মুসলিম দায়ীর, যাদের সবকিছু হবে আল্লাহর জন্য। ঈমান হবে হিমালয়ের মত। যাদের পরিচয় হবে ‘রুহবান ফিল লাইল, ফুরসান ফিন নাহার’। যদি সত্যিই তাদের পাওয়া যায় তাহলে ইসলাম সোনালী প্রভাতের রক্তিম সূর্য হয়ে আবার উদ্ভিত হবে। কবি ফররুখের ভাষায়-
আবার বিলাল হাঁকিবে আযান মক্কার ঐ মিনার চূড়ে/হায়দারি হাঁক হাঁকবোরে ফের উঠব
আবার বিশ্ব ফুঁড়ে।

কুরআন ও হাদিসের আলোকেঃ

“ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ করো।” (সূরা আল-বাকারাহ: ১২০)
“وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ أَنَاذِرِ الْفِتَنَ الَّتِي هِيَ أَلَمٌ لِّلْكَافِرِينَ لَئِنْ أَتَوْا بِبُرْهَانٍ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ لَنَنَسِفَنَّ الْإِسْلَامَ وَكُلَّ الَّذِي يَدْعُوهُ يَوْمَئِذٍ” (সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯)
“ইহুদি ও নাসারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, কারণ তারা তাদের নবীদের পর থেকে নিজেদের মনগড়া ধর্ম চালু করেছে।” (তিরমিযি)

খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধের উপায়সমূহঃ

এ পরিস্থিতিতে আমাদের যা করণীয় বা বাস্তবতার ভিত্তিতে যে উপযোগী কৌশল ও শরৎ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- (১) সকল মুসলিম, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের অন্তরে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মৌলিকভাবে গেঁথে দেওয়া। আর তা করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাগারে সরকারী ও জাতীয় ভিত্তিতে।
- (২) মুসলিম জাতির সর্বস্তরে দীনের বাস্তব জ্ঞানের সম্প্রচার এবং হৃদয়ে দীনী আত্মমর্যাদা, পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধ পুরোপুরি জাগ্রত করা।
- (৩) খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের যাবতীয় উপকরণ: ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা-প্রচারণা ইত্যাদির প্রবেশ পথ চিহ্নিত করতঃ এগুলোর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং এর অবাধ্যতায় দমনমূলক শাস্তিবিধান করা।
- (৪) জনসাধারণকে তাদের পাতানো ফাঁদ থেকে বাঁচানো ও সাবধান করার জন্য খ্রিস্টানদের মিশনের ভয়াবহতা, অপকৌশল ও পন্থাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- (৫) মুসলিমের জীবনের সকল মৌলিক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত দিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে যত্নবান থাকা, কেননা বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো খ্রিস্টানরা এ দুটি মারাত্মক পথেই মানুষের অন্তরে ও মগজে ঢুকে পড়েছে।
- (৬) প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো পরিস্থিতির শিকার হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দীন ও আকীদাকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং সে ব্যক্তিগত ও তার অধীনস্থদের জীবনে ইসলামী নিয়ম-নীতি ও নির্দেশাবলীকে যতদূর সম্ভব

সু-প্রতিষ্ঠিত করা, যার ফলে তার বাড়ীর প্রতিটি সদস্য যেন ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত ঈমান, আকীদা ও চরিত্র বিনষ্টকারী সংগ্রামের মুকাবিলায় সুরক্ষিত থাকতে পারে।

(৭) বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, যেমন চিকিৎসা বা এমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা যা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে অবর্তমান, এমন উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ও পরিবারের কাফির রাষ্ট্রে ভ্রমণ করা থেকে সাবধান থাকা। আর উক্ত প্রয়োজনে যদি ভ্রমণ করতে হয় তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্মীয় ফিতনা ও সংশয় প্রতিহত করার প্রস্তুতি সাথে থাকতে হবে।

(৮) মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে; যার ফলে মানবাধিকার রক্ষিত হবে এবং মুসলিমদের যাবতীয় অভাব দূরীকরণে সমবায়ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী দাতব্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে, এর ফলে তাদের অভাব ও দারিদ্র বিমোচনের নামে খ্রিস্টানদের কালো থাবা তাদের ওপর প্রসারিত হবে না।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে তাঁর সুন্দর-সুন্দর নাম ও উচ্চ গুণাবলীর উসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিমদের বিক্ষিপ্ততাকে একত্রিত করে দেন, তাদের পরস্পরের আন্তরিকতাকে সুদৃঢ় করেন, তাদেরকে সংশোধন করেন এবং প্রশান্তির পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন, পক্ষান্তরে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রদান করেন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।

নিশ্চয় তিনি অতিশয় দয়াবান।

হে আল্লাহ! যে কেউ ইসলাম ও মুসলিমদের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে তাকে তার নিজের ব্যাপারে ব্যস্ত রাখো, তার ষড়যন্ত্র তার ঘাড়ে ফিরিয়ে দাও এবং তার সকল অনিষ্ট পোষণের গন্ডি তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين

উপসংহারঃ

আমরা যতটা রসমের কাছে পরাজিত ততটা হাজতের কাছে পরাজিত নই। আমাদের এই মুহূর্তে দরকার কিছু দায়ী, যারা এরতেনাদের তুফানে জর্জরিত প্রতিটি এলাকায় বসে যাবে। এর জন্য খুব মেধাবী হতে হবে এমন নয়। হতে হবে পরিশ্রমী ও মুখলিস। হতে হবে দ্বীনের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতার অধিকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শাহজালাল ইয়ামানী, খান জাহান আলী পর্যন্ত এবং এর পরেও এক বিশাল জামাত দ্বীনের জন্য ছিন্নমূল হয়েছেন। ইসলামের মৃত এই সুন্নতকে যিন্দা করলে কাদিয়ানী ও মিশনারী ফেতনার চলমান তুফান ইনশাআল্লাহ থেমে যাবে। কারণ আমাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ, আল্লাহ আযমত ও আখেরাতের অনুভূতি এবং সীরাতে সাহাবার মত পুঁজি ও পাথেয় আছে, যা অন্য কারোর কাছে নেই। এখন প্রয়োজন বিধি মত কাজে লাগানো। দেশে কয়েকটি জায়গায় এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা আমাদের সফলতা দিয়েছেন। এ জন্য দরকার ইলম ও হেকমত, ইখলাস ও আখলাক এবং জনসাধারণকে সাথে নিয়ে চলার যোগ্যতা। আর এই সকল গুণের জন্য প্রয়োজন এখলাস ওয়ালাদের সোহবত ও শায়খে কামেলের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা।

যেহেতু এ সকল বাতিল ফেরকা তাদের দায়ীদের প্রশিক্ষণ দেয়, তাই আমাদের দায়ীদেরও কিছু প্রশিক্ষণ দরকার। বড়রা চিন্তা করবেন, এমন হতে পারে কি না যে, এক বছরকে তিন ভাগ করে একভাগ তিন চিল্লায়, একভাগ সোহবতে, একভাগ মুতালআয় লাগানোর পর এমন আক্রান্ত এলাকায় বসিয়ে দেয়া হল। ইখলাস ও ইতকানের সাথে কাজ করলে আল্লাহ তাআলা তার সাহায্যের ওয়াদা সেখানেও বাস্তবায়ন করবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের ফারেগীনদের একটি অংশও যদি এ কাজে চলে আসেন তাহলে মুসলমানের সন্তান মুসলমানিত্ব নিয়ে কবরে যেতে পারবে। দেখুন, পূর্বতীমুর আর দক্ষিণ সুদানের তিক্ত পরিস্থিতি আমাদের সামনে রয়েছে। আল্লাহ হেফাযত করুন, ঐ অবস্থার সৃষ্টি হলে আমাদের সাধারণ কাজগুলোও অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। একবার হাত থেকে বের হওয়ার পর সেটা আর ফিরে আসে না। স্পেনকে মুসলিম উম্মাহ আর ফিরে পায়নি। বাহ্যত সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তাই সময় থাকতেই উম্মতের হেফাজতের ফিকির করতেই হবে। কম শ্রমে স্বল্প উপকরণে অধিক ফল পেতে হলে উপরের এ পন্থাকে কার্যকর ও নিরাপদ মনে হয়।

আমাদের দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে

التخصص في الرد على الفرق الباطلة

তথা 'কিসমুদ দাওয়াহ' গুরুত্বের সাথে নেয়া দরকার। এখন এক একটি প্রতিষ্ঠানকে এক একটি আক্রান্ত এলাকার দায়িত্ব নিতে হবে। কিছু দায়ী বেছে বেছে প্রস্তুত করতে হবে।

মাদরাসা যদি তাদের দুনিয়াবী হাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে এ কাজ আরো সহজে হতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

রেফারেন্সঃ

- ১। উত্তরবঙ্গে খ্রিষ্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা - মুফতি জসিম উদ্দিন
- ২। মাসিক আল ইখলাস
- ৩। মাসিক আল কাওসার
- ৪। ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া